বিবেক মানস

প্রার্থনাপুরুষ বিবেকানন্দ

স্বামী একচিত্তানন্দ

অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মিশন রেসিডেন্সিয়াল কলেজ, নরেন্দ্রপুর

১৯৪।

ঘটনাটি এখন সকলেরই জানা। 'মনের ওপারের দেশে' অখণ্ডের ঘর। দেব-মানব-গন্ধর্ব—কারও প্রবেশাধিকার নেই যেখানে—তার 'সমরস জ্যোতির্মণ্ডলের একাংশ' জমাট বেঁধে রূপ নিল এক দিব্যশিশুর। শিশু দেখতে পেলেন সাত মহর্ষিকে; সমাধিতে বুঁদ হয়ে আছেন তাঁরা। অনুপম মমতায় তাঁদেরই একজনার গলা জড়িয়ে ধরে দিব্য বালক বললেন, "আমি যাচ্ছি, তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।" প্রেমডোরে বাঁধা পড়লেন ধ্যানোত্থিত ঋষি। সম্মতি জানালেন সস্মিত বদনে। কাম-কাঞ্চন-অবিদ্যার ভীষণ ব্যাধিতে প্রপীড়িতা পৃথিবীর দুঃখভার মোচনে প্রতিশ্রুত হলেন তিনি।

দিব্যশিশু শ্রীরামকৃষ্ণের এক অলৌকিক প্রার্থনায় রচিত হল নতুন যুগের মহাকাব্যসঙ্গীতের উপক্রমণিকা; নির্মিত হল স্বামী বিবেকানন্দের মানুষী লীলার প্রেক্ষাপট।

প্রার্থনা আর বিবেকানন্দ-জীবন জড়িয়ে আছে ওতপ্রোতভাবে।

সমাধিস্থ ঋষির ইহজীবন যেন বিরামহীন প্রার্থনার এক অনবদ্য চিত্রসংকলন।

স্বপ্ন দেখেছিলেন কুশলী চিত্রকর শ্রীরামকৃষ্ণ। স্বপ্ন আর বাস্তব মিলে যায় একদিন। সামনে এসে ধরা দেন নরশ্রেষ্ঠ নরেন্দ্র। প্রথম দর্শনের পর ডাক ছেড়ে কাঁদতে থাকেন ঠাকুর—ক্রমান্বয়ে ছয় মাস : "ওরে তুই আয় রে, তোকে না দেখে আর থাকতে পারচি না।"

নাটকীয় ঘটনামালা থেমে থাকেনি সেখানে। জগজ্জননীর ভাবোন্মত্ত সন্তান 'পরাণবন্ধুর' দর্শনে উদ্বেলিত হয়ে মায়ের কাছে করেছেন এক অদ্ভুত আব্দার : "মা, ওর (নরেন্দ্রের) ভেতর একটু মায়া প্রবেশ করিয়ে দে।" অতিশয়োক্তি হবে না যদি বলা হয় যে স্বামীজীর জীবনের উত্তরকাণ্ড—তাঁর সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠা, ভাবপ্রচার, সেবাযজ্ঞের প্রবর্তন—এ-বিরাট কর্মসত্রের মূলে নিহিত ছিল এই বিচিত্র প্রার্থনা।

শ্রীগুরুর, গর্ভধারিণীর প্রার্থনার বলে তাঁর অবতরণ, শ্রীগুরুর প্রার্থনার শক্তিতেই তাঁর মানবলীলা সংঘটন ও সংবরণ। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের পর্বে-পর্বান্তরে প্রার্থনার মন্ত্র অনুরণিত হয়েছে বিরামবিহীন। সে-মন্ত্রের উচ্চারণ লোকহিতায়, 'জগদ্ধিতায়'। আমরা কান পেতে শুনি, আর মনে হয়—এ আমাদেরই প্রাণের আকুতি।

বালক নরেন্দ্রনাথের ঐকান্তিক নিবেদনের চিত্র বিধৃত আছে 'লীলাপ্রসঙ্গে'র পাতায় পাতায়। কথকঠাকুরের বর্ণনা শুনে কদলীবনে গিয়ে মহাবীরের দর্শনলালসে প্রাণ উজাড় করা প্রার্থনায়, নিত্য আরাধিত রামসীতার বিগ্রহের সঙ্গে আসন্ন বিচ্ছেদের কল্পনায় অবিরল অশ্রুমোচনে প্রতিভাসিত হয়েছে তার কয়েকটি রূপচিত্র। হৃদয়ে এই শুদ্ধ, পবিত্র ভাব লালন করেই ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের এক মাহেন্দ্রলগ্নে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে এসে পৌঁছেছেন নরেন; সত্যদ্রষ্টার কাছে এসেছেন সত্যসন্ধ। সংগীত রচনা করেছে সেতুবন্ধ। 'কথামৃত'-কারের বর্ণনায় নরেন সেদিন গেয়েছিলেন—'মন চল নিজ নিকেতনে' এবং 'যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে'। লক্ষণীয়, প্রচলিত ব্রাহ্ম উপাসনা সংগীতগুলির মাঝে এ-দুটি গান একটু ব্যতিক্রমী। ঈশ্বরের ঐশ্বর্যের বর্ণনা নেই গান দুটিতে, আছে চরম বৈরাগ্যের অভয়মন্ত্র।

শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যলাভের প্রাক্কালে, 'লীলাপ্রসঙ্গ'কারের বর্ণনানুসারে—নরেন্দ্রনাথের জিজ্ঞাসু মন নিয়ত-পরিবর্তনশীল জগতে স্থির অবলম্বন হিসেবে খুঁজে পেতে চাইছিল এক নিত্য পুরুষকে, কিন্তু প্রচলিত ধর্মমতগুলিতে নিজের জীবনজিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে পাচ্ছিল না। শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসে নরেন্দ্র তাঁর প্রশ্নের স্পষ্ট, ইতিবাচক উত্তর পেলেন; তাঁর পাশ্চাত্য জ্ঞানের ভিতটি নড়তে শুরু করল অতীন্দ্রিয় অনুভবের শক্তিতে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ঠাকুর কখনও তাঁর স্বভাবজ বিচারপ্রবণতা ও অনুসন্ধিৎসাকে বর্জন করতে আদেশ করেননি, শুধু এক জগৎনিয়ন্তা পুরুষের কাছে ব্যাকুল প্রার্থনায় তাঁকে উৎসাহিত করেছেন। অভিনব সে-প্রার্থনার ভাষা : "হে ঈশ্বর, তুমি কেমন তা জানি না; তুমি যেমন, তেমনি ভাবে আমায় দেখা দাও।" অধ্যাত্মপিপাসু নরেন্দ্রনাথ নবলব্ধ মন্ত্রকে সম্বল করে ডুব দিয়েছেন অন্তরের গহনতম দেশে; বলেছেন, "হে ঈশ্বর, তুমি তোমার সত্যস্বরূপ দর্শনের আমাকে অধিকারী কর।"[১] ভগবৎজিজ্ঞাসার এ এক মৌলিক অভিব্যক্তি, সম্ভবত যুগের প্রয়োজন অনুধাবন করে, যুগমানসের প্রকৃতি বিচার করেই 'নূতন ধর্ম, নূতন বেদ'-এর পাশাপাশি এই 'নূতন জিজ্ঞাসার' অনুবর্তন। কোনও কল্পনা বা স্বতঃসিদ্ধবর্জিত এই অকপট, সরল প্রার্থনা ভগবান বুদ্ধের আকস্মিক, অপ্রত্যাশিত এক দর্শনে পেয়েছিল পরম সার্থকতা।

কিন্তু বিধাতার ইচ্ছে নয়, নরেন্দ্রের জীবনতরী দখিনা বায়ুতে তরতর বেগে এগিয়ে চলে। অকাল পিতৃবিয়োগের পর দারুণ সাংসারিক সংকটের সম্মুখীন হলেন তিনি—পরিণামে দয়াময় ঈশ্বরের অস্তিত্বে সংশয়, অনন্যোপায়—অন্তিমলগ্নে শ্রীরামকৃষ্ণচরণে নিবেদন : "মা ভাইদের আর্থিক

১।৫।

কষ্ট নিবারণের জন্য আপনাকে মাকে বলতে হবে।" কিন্তু ঠাকুরের আর্জি—নরেন্দ্র নিজেই যেন মুখ ফুটে বলেন মাকে। তারপরের ঘটনা ইতিহাস। শ্রীরামকৃষ্ণের 'মিরাকল'-এ মঙ্গলবারের মহানিশায় ভবতারিণী মন্দিরে জগৎ প্রত্যক্ষ করল এক অদ্ভুত রূপান্তর। মৃন্ময়ীতে চিন্ময়ীদর্শন করে নরেন্দ্রনাথ চাইলেন : "মা, বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও; জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, যাতে তোমার অবাধ দর্শন নিত্য লাভ করি এমন করে দাও।"[২] বার বার তিনবার। শ্রীরামকৃষ্ণ হাসলেন বিজয়ীর হাসি। সব হারিয়ে সব পেয়েছে তাঁর সাধের 'লরেন'।

বলা বাহুল্য, এ-ঘটনা শুধুমাত্র নরেন্দ্রনাথের জীবনের প্রেক্ষাপটে নয়, বরং সমকালের ও ভাবীকালের ইতিহাসে এক বিপুল বার্তাবাহী। শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে ধরিয়ে দিয়েছেন যোগানন্দজী: "নরেনের মধ্যে ঋষির বেদজ্ঞান, শঙ্করের ত্যাগ, বুদ্ধের হৃদয়, শুকদেবের মায়ারাহিত্য ও ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ একসঙ্গে রয়েছে।"

জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য—সবই অন্তরে ছিল। ছিল বলেই চাইতে পারলেন। "বাহির হয়ে এসো তুমি যে আছো অন্তরে!" ধর্মের সংজ্ঞায় যিনি বলবেন : 'Religion is the manifestation of the divinity already in man'—তিনি তো সত্তার বহির্মুখীন অস্তিত্বে বিশ্বাসী হতে পারেন না! যদি অন্তরে পেতেন না সম্পদ, চাইতেও পারতেন না নিশ্চিত। বাইরে কারও কাছে হাত পাতার অর্থ 'ভিক্ষাবৃত্তি', নয়তো 'দোকানদারি'। দুটিই যে নরেন্দ্রের স্বভাববিরুদ্ধ! তবু তো চাইতে হবে!

চাইতে হবে বিশ্বমানবের জন্য, যাদের দিকে তাকিয়ে কবি আক্ষেপ করে গেয়েছিলেন : "এরা চাহিতে জানে না, দয়াময়!" জীবনে চাওয়া-পাওয়ার অঙ্ক মেলে না কোনওদিন। হয়তো এ-কারণেই মেলে না যে, আমরা চাইতে শিখিনি আদৌ। "যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না।" ভগবান এলেন এযুগে; দেখালেন, চাইতে শিখতে হয়! অন্তরঙ্গদের সঙ্গে দেখা হলেই ঠাকুর জিগ্যেস করতেন : "তুই কি চাস?"

উত্তর দিলেন লোকশিক্ষক।

মৃন্ময়ীতে চিন্ময়ীদর্শন করে জগৎ ভুল হল।

জগৎবুদ্ধি ফিরে এল যখন—শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে চাইলেন মা-ভাই-বোনদের 'মোটা ভাতকাপড়ের জন্য'। সম্মতি জানালেন ঠাকুর, হলেন কল্পতরু। হতে পারলেন না কিন্তু কাশীপুরে। নরেন চেয়েছিলেন নির্বিকল্প সমাধি : "আমার ইচ্ছা হয়, শুকদেবের মতো পাঁচ ছয় দিন ক্রমাগত একেবারে সমাধিতে ডুবে থাকি, তারপর শুধু শরীররক্ষার জন্য খানিকটা নিচে নেমে এসে আবার সমাধিতে চলে যাই।"[৩] শুনে খুশি হলেন না সমাধিসম্রাট! প্রাণের সাধ তাঁর—মায়ার সঙ্গে খেলবে নরেন, জিতবে হেলায়। জিতবে শুধু নিজের জন্য নয়, পরের জন্যও। 'বুড়ি ছোঁয়ার' কায়দাটা আসলে ধরিয়ে দেবে আর পাঁচজনাকে!

এ-নরেনকে যে বাজিয়ে নিয়েছেন ঠাকুর! দেখেছেন—প্রকট দারিদ্র্যের দিনে অবিদ্যারূপিণী মা যখন তাঁর পবিত্রতার পরীক্ষা নিতে এসেছেন, দুহাত তুলে প্রার্থনা করেছেন নরশ্রেষ্ঠ নরেন্দ্র : "আপনার মঙ্গল হোক, এই আমি চাই। আপনি যদি বুঝে থাকেন যে, এভাবে জীবনযাপন করা পাপ, তবে একদিন না একদিন আপনি এ থেকে উদ্ধার পাবেন নিশ্চয়।"[৪]

উদ্ধার পাবেন 'বারবনিতা' নামধারিণী জননী।

উদ্ধার পাবেন আসমুদ্রহিমাচলের মূঢ়, ম্লান, মূক গণদেবতাও। কন্যাকুমারীতে দেশের শেষ শিলাখণ্ডে বসে জানি না কী ভাষায় মাতৃচরণে আর্তি

জানিয়েছিলেন বিবেকানন্দ; শুধু জানি অনুচ্চারিত মন্ত্রের হিল্লোলে কুম্ভকর্ণের হয়েছিল নিদ্রাভঙ্গ, মৃতপ্রায় জাতির শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে জেগেছিল প্রাণের স্পন্দন।

উত্তরকালে পাশ্চাত্য থেকে প্রত্যাগমনের পর সমকালীন দেশসেবকদের ধরিয়ে দিয়েছিলেন স্বামীজী: ভারতবর্ষ কোনও ভৌগোলিক ভূখণ্ডের নাম নয়, বরং একটি অখণ্ড সত্যের প্রতিভূ। স্বদেশমন্ত্রে শেখালেন প্রার্থনার নতুন আঙ্গিক: "আর বল দিনরাত—'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও! মা, আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর!' " মানুষ হওয়ার সাধনা আত্মনিবেদনের মহা-অঙ্গীকার; স্বদেশব্রতীর কাছে, অধ্যাত্মপিপাসুর কাছেও।

'মা' একজনই; স্বদেশমাতৃকার প্রতিমায় তাই 'বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা'! সেই মায়ের সঙ্গে চলল 'বুড়ি বুড়ি' খেলা। এল সাগরপারের ডাক, বুড়ো বামুনের হাতছানি। নিঃসংশয় হতে 'মায়ের ছেলে'র ব্যাকুল প্রার্থনা : "মা, তোমার কি ইচ্ছা বল।"

আমরা জানি, মা তাঁর বার্তা গোপন রাখেননি।

শিকাগোয়—'একালের কুরুক্ষেত্রে'—পাঞ্চজন্য শাঁখ বাজল পার্থসারথির। মুণ্ডিতকেশ যোদ্ধার অন্তর-ভুবন উদ্ভাসিত হল লোকলোচনের সামনে। ধর্মমহাসভার প্রথম দিনে 'ঝোড়ো সন্ন্যাসী'র তিন মিনিটের ভাষণ শেষ হল মর্মস্পর্শী আবেদনে : "এই ধর্ম-মহাসমিতির সম্মানার্থ আজ যে ঘন্টাধ্বনি হয়েছে, তা-ই... একই লক্ষ্যের দিকে অগ্রগামীদের মধ্যে সর্বাধিক অসদ্ভাবের সম্পূর্ণ অবসানের বার্তা ঘোষণা করুক।"[৫]

ধর্মমহাসভায় মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের পাশাপাশি আর একটি মূলমন্ত্রের উদ্ঘোষণ করেছিলেন স্বামীজী আর তা হচ্ছে বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্যের সন্ধান। ১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ 'হিন্দুধর্ম' বক্তৃতার পরিসমাপ্তি হল উদার, গণ্ডিভাঙা একটি প্রার্থনায় : "প্রত্যেক ধর্মেই ঈশ্বর আছেন—

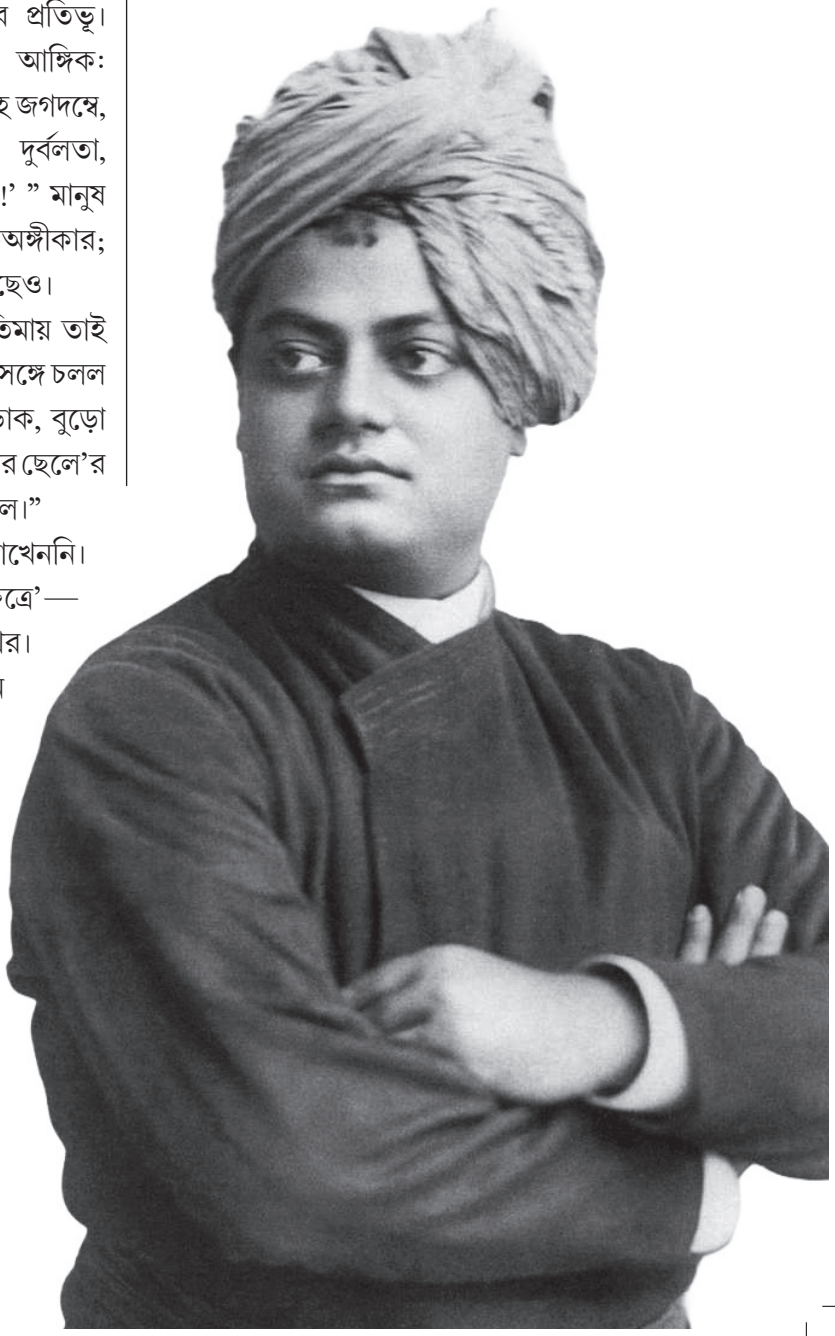

সমগ্র জগতে এ-কথা ঘোষণা করার ভার আমেরিকার জন্যই সংরক্ষিত ছিল। যিনি হিন্দুর ব্রহ্ম, পারসিকদের অহুর-মজদা, বৌদ্ধদের বুদ্ধ, ইহুদীদের জিহোবা, খ্রীষ্টানদের 'স্বর্গস্থ পিতা', তিনি তোমাদের এই মহৎ ভাব কার্যে পরিণত করবার শক্তি প্রদান করুন।"

ভাবনায় ফাঁক নেই কোথাও। দেশে ফিরে এসে এই বিবেকানন্দই রামনাদ অভিনন্দনের উত্তরে বলবেন : "যিনি শৈবদের শিব, বৈষ্ণবদের বিষ্ণু, কর্মীদের কর্ম, বৌদ্ধদের বুদ্ধ, জৈনদের জিন, ঈশাহী য়াহুদীদের য়াভে, মুসলমানদের আল্লা, বৈদান্তিকদের ব্রহ্ম—যিনি সকল ধর্মের সকল সম্প্রদায়ের প্রভু... সেই দয়াময় প্রভু আমাদের আশীর্বাদ করুন,... শক্তি দিন, যাতে আমরা আমাদের উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করতে পারি।"[৬] সকল ভাবের অনুগামী সকল সম্প্রদায়কে নিয়ে গড়ে উঠবে একটি 'অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায়'। গড়ে উঠবে সমন্বয়মূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করেই। কলকাতা অভিনন্দনের উত্তরে স্বামীজী ব্যক্ত করলেন প্রাণের আকুতি : "আমি আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করছি, সেই রামকৃষ্ণ পরমহংস আমাদের জাতির কল্যাণের জন্য, আমাদের দেশের উন্নতির জন্য, সমগ্র মানবজাতির হিতের জন্য তোমাদের হৃদয় খুলে দিন;... যে মহাযুগান্তর অবশ্যম্ভাবী, তার সহায়তার জন্য তিনি তোমাদের অকপট ও দৃঢ়ব্রত করুন।"[৭]

অকপটতা শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শনের একটি মূলমন্ত্র। যেখানে সারল্য, যেখানে মনমুখের সমীকরণ—সেখানেই বিবেকানন্দের স্বীকৃতি, সেখানেই স্বত উৎসারিত তাঁর প্রার্থনা। পুত্রধন লাভ করতে চেয়েছিলেন খেতড়িরাজ অজিত সিং। আশ্রিত সন্তানের জন্য প্রার্থনায় কণ্ঠ মিলিয়েছিলেন স্বামীজী। সফল হয়েছিল চাওয়া। হরিপদ মিত্র, ইন্দুমতী মিত্র—স্বামীজীর প্রথম দীক্ষিত দম্পতি। পুত্রমুখসন্দর্শনে বঞ্চিতা ইন্দুমতীকে স্বামীজী চিঠিতে লিখলেন, "সর্বদা শ্রীহরির নিকট তোমাদের কল্যাণ প্রার্থনা করিতেছি।... প্রভুর নিকট প্রার্থনা করি, তুমি শীঘ্রই পুত্রবতী হও।"[৮] গীতার মনস্ক পাঠক স্মরণ করতে পারবেন দশম অধ্যায়ে ভগবানের শ্রীমুখে উচ্চারিত আশ্বাসবাণী : "ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ।"

ধর্মকে, ঈশ্বরমুখিনতাকে অবলম্বন করে যদি ঘটে জাগতিক অভ্যুদয়, পরিণামে তা নিঃশ্রেয়স সাধনেরই সোপান হয়; ধর্ম-অর্থ-কাম হয় মোক্ষের অভিসারী। শ্রীরামকৃষ্ণের অনুপম অভিব্যক্তি : "একের পর যদি পঞ্চাশটা শূন্য থাকে অনেক হয়। এককে পুছে ফেললে কিছুই থাকে না।"

জুনাগড়ের দেওয়ান হরিদাস বিহারীদাস দেশাইকে ২২-৮-১৮৯২ চিঠি লিখলেন স্বামীজী। তাঁর মহাপ্রাণতা, সেবাপরায়ণতার জন্য অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বললেন, "আমি শুধু এইটুকু প্রার্থনা করতে পারি যে, সর্বমঙ্গলবিধাতা ভগবান আপনাকে ইহলোকে বাঞ্ছিত সমস্ত ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ করুন; আর আপনাকে অতি দীর্ঘায়ু দান করে অবশেষে তাঁর অনন্ত মঙ্গল ও শান্তিময় পবিত্র কোলে টেনে নিন।"[৯] বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হ্যারিয়েট হেলকে নবজীবনের পূর্ণাঙ্গ সাফল্য কামনা করে স্বামীজী লিখলেন, "তোমাকে ও তোমার ভাবী বরকে আমার অনন্ত আশীর্বাদ।... তুমি সারাজীবন উমার মতো পবিত্র ও নিষ্কলুষ হও, আর তোমার স্বামীর জীবন যেন উমাগতপ্রাণ শিবের মতোই হয়।"[১০] 'শিবের মতোই' গুরুকে পেয়েছিলেন মেরি লুইজ (স্বামী অভয়ানন্দ)। কিন্তু পিছুটান হয়ে দাঁড়াল অর্থের প্রত্যাশা। ওলি বুলকে

সখেদে লিখছেন স্বামীজী : "সে যেন এবারে প্রচুর অর্থ পায় এই আমার আকাঙ্ক্ষা।... সে টাকা চেয়েছিল, ভগবান তাকে প্রচুর টাকা দিন।"[১১]

চিঠিগুলিতে একটি সাধারণ প্রবণতা লক্ষণীয়। জাগতিক সুখকে কোথাও চরম লক্ষ্য বলে নির্দেশ করা হয়নি; বরং পরম প্রাপ্তির পথে একটি সোপান জেনে আছে তাকে ছাপিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত, সীমার রাজ্যে অসীমের আহ্বান। সে-আহ্বান স্বামীজী শুনেছেন তাঁর জীবনদেবতা শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে। বিশেষত, তিনি যখন স্থূলশরীরে বর্তমান।

আর তিনি যখন অপ্রকট?

সঙ্ঘ তো ঠাকুরেরই! তাঁর সশরীর উপস্থিতি চেয়ে বারবার আর্জি করেছেন স্বামীজী। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ১ মে বলরাম ভবনে রামকৃষ্ণ মিশন অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠার দিনে সমবেত জনতার উদ্দেশে আবেদন করলেন : "আমরা যাঁর নামে সন্ন্যাসী হয়েছি, আপনারা যাঁকে জীবনের আদর্শ করে সংসারাশ্রমে কার্যক্ষেত্রে রয়েছেন,.. এই সঙ্ঘ তাঁরই নামে প্রতিষ্ঠিত হবে। আমরা প্রভুর দাস। আপনারা এ-কার্যে সহায় হোন।"[১২]

৯ ডিসেম্বর ১৮৯৮। আত্মারাম এসেছেন বেলুড় মঠে। সত্যযুগের অরুণোদয়ে উল্লসিত যুগন্ধর ঋষি গেয়ে উঠলেন : "আপনারা আজ কায়মনোবাক্যে ঠাকুরের পাদপদ্মে প্রার্থনা করুন যেন মহাযুগাবতার ঠাকুর আজ থেকে বহুকাল 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' এই পুণ্যক্ষেত্রে অবস্থান করে একে সর্বধর্মের অপূর্ব সমন্বয় কেন্দ্র করে রাখেন।"[১৩]

সমন্বয় সর্বধর্মের, সর্বদর্শনের, চতুর্যোগের।

'বিশ্বজনীন ধর্মের উপায়' বক্তৃতায় স্বামীজী বললেন, "অতীতে যত ধর্মসম্প্রদায় ছিল, আমি সবগুলিই সত্য বলে মানি এবং তাদের সকলের সঙ্গেই উপাসনায় যোগদান করি। প্রত্যেক সম্প্রদায় যে-ভাবে ঈশ্বরের আরাধনা করে, আমি তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে ঠিক সেই ভাবে তাঁর আরাধনা করি। আমি মুসলমানদের মসজিদে যাব, খ্রীস্টানদের গীর্জায় প্রবেশ করে ক্রুশবিদ্ধ ঈশার সামনে নতজানু হব,... বুদ্ধের ও তাঁর ধর্মের শরণ নেব।... যে হিন্দু ধ্যানমগ্ন, আমি বনে গিয়ে তার পাশে বসে ধ্যানে ডুবে যাব।"[১৪]

প্রার্থনাভূমিতে মুছে যায় দ্বৈত-অদ্বৈতের ভেদরেখা, জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম-যোগের সীমান্তচিহ্ন।

পূজনীয় গম্ভীরানন্দজী বলছেন, "অরূপের ঘরে যখন শ্রীঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে দেখিয়াছিলেন, তখন নরেন্দ্রনাথ অখণ্ডের মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়াও স্বীয় ব্যক্তিত্ব অটুট রাখিয়াছিলেন—একই সময়ে তিনি ছিলেন দ্বৈত-অদ্বৈত উভয় ভূমিতে অধিরূঢ়।"[১৫] দ্বৈতভূমিতে অবতীর্ণ হয়ে আপনাতে জীববুদ্ধি আরোপ করে তিনি যখন শ্রীরামকৃষ্ণ-আরাত্রিক ভজনে উচ্চারণ করেন—'দেহ পদে অনুরাগ'—তখন উপাসক-উপাস্যের মাঝে বিভাজিকা রেখা বিলীয়মান হলেও খুব স্পষ্ট।

'জ্ঞানযোগে', 'কর্ম-পরিণত বেদান্তে' একই বিবেকানন্দ অদ্বৈতকেই পরতত্ত্ব বলে প্রতিষ্ঠা করে উন্মোচিত করেন প্রার্থনার একটি স্বতন্ত্র দিগন্ত : "হে, স্বপ্রকাশ, জ্যোতির্ময়, ওঠ! হে সদাশুদ্ধস্বরূপ, ওঠ! হে অজ, অবিনাশী, সর্বশক্তিমান, ওঠ! আত্মস্বরূপ প্রকাশ কর। তুমি যে-সকল ক্ষুদ্রভাবে আবদ্ধ হয়ে আছ, তা তোমাতে সাজে না।" স্বামীজী বলছেন : "অদ্বৈতবাদ এই শ্রেষ্ঠ প্রার্থনার শিক্ষা দিয়ে থাকেন।"[১৬]

প্রার্থনায় স্বামীজী দেখেছেন চার যোগের সমাপতনবিন্দু। জ্ঞানযোগী বিবেকানন্দ প্রার্থনা করেন : "আমার ভয় নেই, সংশয় নেই, মৃত্যু নেই,.. আমার কখনও জন্ম হয়নি,... হে পরমেশ্বর, নিজ মহিমা প্রকাশ কর, স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হও!" ক্যালিফোর্নিয়ায় পরিব্রাজক-জীবনের স্মৃতিচারণ

।১৯।

করতে গিয়ে বলেছিলেন, "কতবার আমি অনাহারে, বিক্ষতচরণে, ক্লান্তদেহে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছি।...কথা বলতে পারতাম না, চিন্তাও অসম্ভব হয়ে পড়ত; আর অমনি মনে এই ভাব উঠত, অমনি আমি পুনর্বল লাভ করে উঠে দাঁড়াতাম।"[১৭] ভক্তিযোগী বিবেকানন্দ প্রার্থনা করেন :—'ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো'। রাজযোগী বিবেকানন্দ প্রার্থনার মন্ত্রে করেন ভূমাসুখের সন্ধান : পুবে-পশ্চিমে-উত্তরে-দক্ষিণে সাধককে প্রবাহিত করতে বলেন পবিত্র চিন্তার তরঙ্গমালা। কর্মযোগী বিবেকানন্দ পরার্থপরতাকেই দান করেন সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতার আসন; প্রার্থনা করেন : "চূর্ণ হোক স্বার্থ-সাধ-মান।" প্রার্থনার মন্ত্রে মিশে যায় চতুর্যোগের রাগিণী, বাজে মহাসমন্বয়ের সুর।

সমন্বয় শুধু ধর্মের বা যোগের নয়, ব্যক্তিচরিত্রেরও। প্রার্থনা হবে সর্বজনীন, সর্বকালিক। 'সুহৃন্মিত্রার্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধু' নির্বিশেষে সকলের জন্য খুলে দিতে হবে প্রার্থনার দ্বার। পুত্রশোকে জর্জরিত হয়েছেন বালাজী রাও। জানতে পেরে স্বামীজী শুনিয়েছেন প্রবোধিনী বাণী। চিঠিতে (১৮৯৩) গীতাচার্য পার্থসারথির কণ্ঠই যেন অনুরণিত : "দিনরাত তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে ভুলো না—'তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক।' হে প্রেমময় পিতা! তুমি যে একান্ত আত্মসমর্পণ শিক্ষা দিচ্ছ, হৃদয়ের জ্বালা তো তা করতে দিচ্ছে না।... প্রভু... হৃদয়ে শান্তি দিন, এই ... সচ্চিদানন্দের প্রার্থনা।"[১৮]

বিবাহবিচ্ছেদের মুখে দাঁড়িয়ে আছেন স্টার্ডি। স্বামীজী সমবেদনার অশ্রু বিসর্জন করে বলেছেন, "প্রভু বেচারীর সহায় হোন—তার সকল বন্ধন তিনি মোচন করুন।"[১৯]

শিকাগো ধর্মমহাসভার পর কুৎসা-অপপ্রচারের ঝড়। পুরোভাগে স্বামীজীরই এক জাতভাই। অধ্যাপক রাইটকে লেখা চিঠিতে মর্মবেদনার কথা জানালেন স্বামীজী; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হিতকামনার সুবাস ছড়িয়ে দিতে ভুল করলেন না : "প্রার্থনা করি, তাঁর যেন চৈতন্য হয়। তিনি উত্তম ও মহান ব্যক্তি, সারা জীবন অপরের মঙ্গল করতে চেয়েছেন।"[২০]

জগৎ জুড়ে বিবেকানন্দ দেখেছেন অশিবের বীভৎস প্রকাশ। তবু সত্তার শিবস্বরূপকে তো ভুলে থাকা চলে না! পাপী-পুণ্যবান, সতী-অসতীর মাঝে সত্তার গুণগত প্রভেদ তো নেই কিছুমাত্র, আছে শুধু প্রকাশের মাত্রার তারতম্য।

বিলাসিতার অপবাদ দিয়েছেন স্টার্ডি। ইঙ্গিত দিয়েছেন সরে দাঁড়াবেন। অবশ্যম্ভাবী বিচ্ছেদের মুখে দাঁড়িয়ে স্বামীজী লিখলেন : "সকল শুভাশিস তোমাদের চিরসাথী হোক—বিবেকানন্দের নিরন্তর এই প্রার্থনা।"[২১]

শুভাশিস চিরসাথি হয়েছে ত্যাগী সন্তান কৃপানন্দ, অভয়ানন্দেরও। ত্যাগের অঙ্কে ভুল করে এঁরা নিজেদের গুরুকেই পরিত্যাগ করেছেন একদিন। যন্ত্রণায় জর্জরিত হতে গিয়ে স্বামীজী দেখেছেন মঙ্গলময়ের প্রসারিত বরাভয় হস্ত। কৃপানন্দ প্রসঙ্গে ওলি বুলকে চিঠিতে লিখলেন, "ল্যাণ্ডসবার্গ বেচারী এই বাড়ি থেকে চলে গিয়েছে।... সে যেখানেই যাক, ভগবান তার মঙ্গল করুন। আমি জীবনে যে দু-চারজন অকপট লোক দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছি, সে তাদেরই মধ্যে একজন।"[২২] কৃপানন্দ চলে গেলেন, কিন্তু ফেরাতে পারলেন না আচার্যের সীমাহীন কল্যাণকামনা। ওলি বুলকে স্বামীজী চিঠিতে লিখলেন, "ভগবান সকলের বন্ধন মোচন করুন, সকলেই মায়ামুক্ত হোক—এই আমার চিরপ্রার্থনা।"[২৩]

অমেয় প্রার্থনার বলে যোগীন্দ্র নরেন্দ্রকে ধূলার ধরণীতে ডেকে এনেছিলেন ঠাকুর। লীলার অন্ত্যপর্বে জগতের সবই যখন প্রতীত হল মায়াময়,

অনিত্য বলে, প্রার্থনার সুরটিই তখন ধ্রুবসত্য বলে প্রতিভাত হল। মিস ম্যাকলাউডকে স্বামীজী লিখলেন, "জীবনের প্রতি আকর্ষণ... কোথায় সরে দাঁড়িয়েছে! রয়েছে কেবল তার স্থলে প্রভুর সেই মধুর গম্ভীর আহ্বান!—যাই, প্রভু যাই!"[২৪] যে-দিব্য বালকের মধুকণ্ঠের প্রার্থনা শুনে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন নরঋষি, তাঁর ডাকই যেন ফিরে এল বৃত্তের সম্পূর্ণতা বিধানের জন্য।

শ্রীগুরু আক্ষেপ করে বলেছিলেন, "তুই... শুধু নিজের মুক্তি চাস!"[২৫] 'মায়ের কাজ' নিষ্পন্ন হল; বিবেকানন্দ মুক্তি প্রার্থনা করলেন সকলের। শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে বললেন, সমষ্টির মুক্তি ছাড়া ব্যষ্টির মুক্তি নেই। শাশ্বতী প্রার্থনায় মিলে গেল আত্মমুক্তি আর জগতের হিত।

শিষ্য হরিপদ মিত্র আশ্চর্য হলেন। একই বস্তুতে দুই বিপরীত ধর্মের যুগপৎ সন্নিবেশ হতে পারে? স্বামীজী বললেন—হতে পারে; যেমন ঘূর্ণায়মান বস্তুতে অভিকেন্দ্র আর অপকেন্দ্র বল।[২৬]

আত্মমুক্তি, জগদ্ধিত—দুয়ে এক, একে দুই।

প্রার্থনার সুরে দুয়ে অভিন্নসত্তা।

প্রার্থনাপুরুষ বিবেকানন্দকে আমাদের আভূমি প্রণতি।

তথ্যসূত্র

১। স্বামী সারদানন্দ, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০০০, ভাগ ২, '*ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ*', পৃঃ ১১২

২। দ্রঃ স্বামী গম্ভীরানন্দ, *যুগনায়ক বিবেকানন্দ*, খণ্ড ১, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০১, পৃঃ ১৩১

৩। তদেব, পৃঃ ১৫১

৪। তদেব, পৃঃ ১২৫

৫। দ্রঃ তদেব, খণ্ড ২, ২০০১, পৃঃ ২৮

৬। *স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা*, খণ্ড ৫, ২০০১, পৃঃ ৩৫-৩৬

৭। তদেব, পৃঃ ১৬৩-৬৪

৮। স্বামী বিবেকানন্দ, *পত্রাবলী*, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০০, পৃঃ ৬৫- ৬৬

৯। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ৫৪

১০। তদেব, পৃঃ ৪৮৯

১১। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ৭৯১

১২। শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী, *স্বামি-শিষ্য-সংবাদ*, উদ্বোধন কার্যালয়,২০১১, পৃঃ ৩৭

১৩। তদেব, পৃঃ ৮৭

১৪। দ্রঃ *স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা*, উদ্বোধন কার্যালয়, খণ্ড ৩, ১৯৯৯, পৃঃ ১৪০

১৫। *যুগনায়ক বিবেকানন্দ*, খণ্ড ১, ২০০১, পৃঃ ২১৯

১৬। দ্রঃ *বাণী ও রচনা*, খণ্ড ২, পৃঃ ২২১

১৭। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ২৯২-৯৩

১৮। দ্রঃ *পত্রাবলী*, পৃঃ ৬০-৬১

১৯। তদেব, পৃঃ ৬২৮

২০। তদেব, পৃঃ ১৩৪

২১। তদেব, পৃঃ ৬৬৭

২২। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ৩৪৪

২৩। তদেব, পৃঃ ৭৯১

২৪। তদেব, পৃঃ ৭২৩

২৫। *যুগনায়ক বিবেকানন্দ*, খণ্ড ১, ২০০১, পৃঃ ১৫১

২৬। সম্পাদনা : স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, *স্মৃতির আলোয় স্বামীজী*, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৯১, পৃঃ ৭১